আদর্শ হিন্দু হোটেল : স্বপ্ন পূরণের আখ্যান

শতরূপা সরকার

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে। একটি বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে অন্য একটি মহারণের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে বিশ্ববাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমশ ভেঙে দিচ্ছে দেশ-সংস্কৃতির গণ্ডি। অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে উপনিবেশগুলির সাধারণ মানুষের। এতদিনের সযত্নে লালিত জীবনদর্শন এক লহমায় নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে — মানুষের হাতে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন ... বড়ো বিপন্ন।

বাংলাদেশে আছড়ে পড়েছে তার ঢেউ। মজুতদার চোরাকারবারি অসৎ ব্যবসায়ীদের রমরমা। অন্যদিকে বাড়ছে বেকার সমস্যা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সামলানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে — বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক কল-কারখানা। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করছে — সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে গান্ধীজি প্রস্তুতি নিচ্ছেন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের — উত্তাল সেই সময়েই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *মাতৃভূমি* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রচনা করলেন *আদর্শ হিন্দু হোটেল*। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস থেকে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়েছিল অর্থাৎ ১৯৩৮-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন। আশ্বিন, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয়েছিল, উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেছিলেন ভ্রাতা শ্রীমান নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এটি বিভূতিভূষণের ষষ্ঠ উপন্যাস।

তৃতীয় বিশ্বের এক অখ্যাত জনপদ রানাঘাট। যুদ্ধের প্রয়োজনে যখন যাতায়াত ব্যবস্থায় রেল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল — তখন জংশন হিসেবে রানাঘাট বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সব ট্রেনই রানাঘাট দিয়ে যাতায়াত করত। এখানের এক সাধারণ হোটেলের রাঁধুনি বামুন হাজারি ঠাকুরকে নিয়ে বিভূতিভূষণ যে সরল, মায়াময় আখ্যান রচনা করলেন — আপাতদৃষ্টিতে তা নিতান্তই তুচ্ছ। হাজারি ঠাকুর ভালো রান্না করে। পাঁচজনের কাছে প্রশংসা পায়, ওদিকে হোটেল মালিক বেচু চক্রবর্তী আর পদ্ম ঝি তাকে দেখতে পারে না। হাজারি ঠাকুরের স্বপ্ন একটা হোটেল খোলার। প্রতিদিন ভোর থেকে বেলা আড়াইটা তিনটা পর্যন্ত প্রকাণ্ড উনোনের তাপে গলদঘর্ম হয়ে সে রান্না করে — আর নির্জন দুপুরে রাধাবল্লভ তলার নাটমন্দিরে বসে চূর্ণী নদীর শান্ত জলধারা দেখতে দেখতে স্বপ্নের জাল বোনে। এমন এক হোটেল সে খুলবে যেখানে খদ্দেরকে ঠকানো হয় না, বাসি-পচা খাবার পরিবেশন করা হয় না, এমনকী আহারান্তে তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে। হোটেলের নাম দেবে — 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। হাজারি ঠাকুরের বয়স ছেচল্লিশ — নিতান্তই গরিব, সাত টাকা মাস-মাইনেতে কাজ করে ... তবুও স্বপ্ন দেখার শক্তি তাকে আর পাঁচজন মানুষের থেকে আলাদা করে দেয়। হাজারির স্বপ্ন বিলাসমাত্র ছিল না — তার নিজের কর্মশক্তি ও পটুত্বের ওপরে নির্ভর করে রচিত

হয়েছিল। তাই হয়তো তার দেশের মেয়ে কুসুম, জমিদারের মেয়ে অতসী বা অচেনা গ্রাম্যবধূ — সকলেই তাদের যৎসামান্য পুঁজি তুলে দিয়েছে হাজারির হাতে। হাজারি ঠাকুরও তার মূল্য রেখেছে। বেচু চক্রবর্তীর হোটেলে অনেক বঞ্চনা ও অত্যাচারের পরে সে বেরিয়ে এসে রানাঘাট বাজারেই নতুন হোটেল খুলেছে। বাজারের অন্য হোটেল স্বভাবতই মুখ থুবড়ে পড়েছে, হাজারির রান্নার খ্যাতির জন্য রেল কোম্পানি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাকে দোকান করে দিয়েছে — এমনকী শেষপর্যন্ত রেল কোম্পানির দেওয়া চাকরি নিয়ে সে বোম্বাই যাত্রা করেছে। উপন্যাসটি হাজারির জীবনের ঊর্ধ্বগামী একরৈখিক চিত্র। অথচ ঘটনা পরম্পরার বিন্যাসে কোথাও অতিনাটকীয় বলে মনে হয় না। যদিও, বিভূতিভূষণসুলভ বিচ্যুতি চোখে পড়ে। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে বংশী ঠাকুর ছিল পাশের হোটেলের ঠাকুর, পরে সে বেচু চক্রবর্তীর হোটেলের রাঁধুনি হিসেবে বর্ণিত।

হাজারি ঠাকুর এবং তার জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে যে কটি চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব বিভূতিভূষণ অন্তর দিয়ে বুঝতেন — আজন্ম পথিক এই লেখক পায়ে হেঁটে চিনেছেন গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষকে, চলার পথে কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতাকে তিনি স্থান দিতেন উপন্যাসে, গল্পে। হাজারি ঠাকুরকেও তিনি পেয়েছিলেন পথ চলতে চলতে — ছুটির সময়ে দেশে গিয়ে বিভূতিভূষণ হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে আসতেন দূর দূরান্তের গ্রাম, পায়ে হেঁটে পিসিমার বাড়ি বাগান-গাঁয়ে যাওয়ার সময়ে পরিচয় হল এক সামান্য লোকের সঙ্গে —

> তার বয়েস ষাট বাষট্টি হবে, রংটা বেজায় কালো, হাতে একটা পোঁটলা, কাঁধে ছাতি।

যাওয়ার পথে কথাবার্তায় বেশ জমে গেল। বেশ সহজ সরল মানুষ। পথে আবার এক পরিচিত ভদ্রলোক বিভূতিভূষণকে জোর করে জজসায়েবের বাড়ি নিয়ে গেল। বলাবাহুল্য পথের সঙ্গীটিও গেলেন। *পথের পাঁচালী*-র লেখকের সেখানে বেশ খাতির যত্ন করা হল। দেখেশুনে সেও বুঝতে পারল ভদ্রলোকটি নেহাত তুচ্ছ নয় —

> ... দাদাবাবু, আপনাকে এতক্ষণ চিনতে তো পারি নি। আপনি মাথা থেকে বের করে এমন একখানা বই লিখেচেন যার অত বড় দামী দামী লোকে এত সুখ্যাতি করলেন, তখন তো আপনি সাধারণ মানুষ নন!
>
> সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় তার সুর গদ্‌গদ্ হয়ে উঠেছে, তারপর বললে, বাবু যদি অনুমতি করেন, আমিও নিজের পরিচয়টা দিই। এতক্ষণ দিই নি কারণ বিদেশে, পথেঘাটে, নিজের পরিচয় না দেওয়াই ভাল। দিয়ে কি হবে? আমার নাম নদে-শান্তিপুর থেকে আরম্ভ করে কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে, আপনার শ্রীগুরুর চরণকৃপায়, হেঁ হেঁ।
>
> কৌতূহলের সহিত ওর মুখের দিকে চাইলুম। কোন্ ছদ্মবেশী মহাপুরুষের সঙ্গে এতক্ষণ আমার ভ্রমণ করার সৌভাগ্য ঘটবে না জানি!
>
> লোকটা বললে — আমার নাম, দাদাবাবু, হাজারী পরটা।
>
> আমি অবাক হয়ে বললুম — হাজারী —?
>
> — আজ্ঞে, হাজারী পরটা।

— হাজারী পরটা?

— আজ্ঞে, সেই আমিই এই অধীন।

বলে সে আমার মুখের ভাব পরিবর্তন লক্ষ করবার জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধহয় আমার বিস্ময়কে পূর্ণ বিকাশের সময় দেওয়ার জন্যে। কিন্তু, আমি তখনও সেই অবাকভাবে চেয়ে আছি দেখে বললে, দাদাবাবু, যদিও আমরা ভট্চায্যি কিন্তু আমার উপাধি পরটা। মানে এমন পরটা আর কেউ তৈরি করতে পারত না নদে-শান্তিপুরের মধ্যে। পাঁচ সের ওজনের একখানা খাস্তা পরটা — যেখানে ধরুণ খসে আসবে। আমার দোকান ছিল গ্রাম চাঁদপাড়ায়, দৈনিক দশ-বারো টাকা বিক্রি, পরটা, লুচি, আলুর দম, ডিম, মাংস। আমার দোকানে যে একবার খেয়েচে দাদাবাবু, সে আপনাদের বাপ-মার আশীর্বাদে কখনো ভুলতো না। কলকাতা পর্যন্ত আমার নাম ডাক। খ্যাঁদা মিত্তিরের বাড়ি রশুই করেচি এক হাত-বেড়িতে পাঁচ বছর।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির প্রয়োজন হল এই কারণে যে বাস্তবের 'হাজারী পরটা' আর উপন্যাসের 'হাজারী ঠাকুর' যেন হুবহু এক। আত্মগরিমা, তৃপ্তি এবং বিনয়ে বাস্তবের চরিত্রটি উপন্যাসে উঠে এসেছে। *ঊর্মিমুখর* নামে বিভূতিভূষণের এই দিনপঞ্জিটি রচিত হয় মে ১৯৩৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ মধ্যবর্তী সময়ে — ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এই সামান্য সূত্র থেকেই সম্পূর্ণ উপন্যাস রচনা করলেন তিনি।

উপন্যাসটি শুধু বিভূতিভূষণের নয়, বাংলা সাহিত্যেরই এক ব্যতিক্রমী উপন্যাস বলে মনে হয়। চরিত্রকেন্দ্রিক, নায়কপ্রধান এই উপন্যাসের মধ্যমণি অশিক্ষিত, দরিদ্র, ছেচল্লিশ বছরের বিশেষত্বহীন এই প্রৌঢ়। নায়কোচিত কোনো গুণ তার নেই — একমাত্র স্বাতন্ত্র্য সে চমৎকার রান্না করতে পারে। পদ্ম ঝি বা বেচু চক্রবর্তীর কাছে মাথা নিচু করে থাকাই তার অভ্যেস। চুরির অন্যায় অপবাদ, অকারণে জরিমানা, অমানুষিক পরিশ্রম — সবকিছুই সে সহ্য করে ব্যক্তিত্বহীন দরিদ্র মানুষদের মতোই। এমনকী হোটেল খুলে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করার পরেও তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি —

অনেকদিন পরে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলের সেই গদির ঘরটিতে গিয়া দাঁড়াইল। সেই পুরানো দিনের মনের ভাব সেই মুহূর্তেই তাহাকে পাইয়া বসিল যেন ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই। যেন সে রাঁধুনী বামুন, বেচু চক্কত্তি আজও মনিব।

তবুও পাঠকের সহানুভূতি থেকে হাজারি ঠাকুর বঞ্চিত হয়নি। কারণ তার বড়ো গুণ উদার মানবিকতা, তার সঙ্গে প্রায় মাতৃসুলভ মায়া। দরিদ্র যতীন চক্রবর্তী খাওয়ার টাকা দিতে না পারার জন্য যখন অভুক্ত অবস্থায় বিতাড়িত হয় — তখন হাজারির মনে হয় —

আহা, পুরানো খদ্দের — ওকে একথালা ভাত দিলে কি ক্ষেতি হত হোটেলের — আমি যদি কখনো হোটেল করি, খেতে এলে কাউকে ফেরাবো না — এতে আমার হোটেল উঠে যায় আর থাকে। একে তো ভাত বেচে পয়সা — তার ওপর খিদের সময় লোককে ফেরাবো?

ক্রমশ মনে হতে থাকে হাজারি ঠাকুর যেন কতগুলো অসহায় মানুষকে আশ্রয় দেবার জন্যেই হোটেল খুলতে চায়। নিজের সন্তানদের জন্য, অনাথা কুসুমের জন্য, দরিদ্র গ্রাম্যবধূটির জন্য এমনকী বংশী ঠাকুরের বেকার ভাগ্নের জন্যেও হাজারি ঠাকুরের হোটেল খোলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। নিঃস্ব হাজারি ঠাকুর ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে পেয়ে যাওয়া টাকাতে হোটেল খোলে। তার স্বপ্নের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এবং ইতিহাসের বিচারে খুবই অদ্ভুতভাবে হাজারির অংশদারী পদ্ধতিতে হোটেল খোলার ধারণাটি মিলে যায়। ১৯৩০ এর দশক বিশ্বজুড়েই অর্থনৈতিক সংকটের দশক নামে পরিচিত। পৃথিবী জুড়েই 'গণতন্ত্র' এবং 'পুঁজিবাদ' বিপন্ন হয়ে পড়তে শুরু করে।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণদানের স্থগিতকরণ ঘোষণা করেছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য অর্থনীতি এর ফলে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রামূল্য হ্রাস (Deflation) শুরু হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান উপনিবেশ ভারতবর্ষে এর প্রভাব পড়েছিল অবধারিতভাবে। বাণিজ্যিক লেনদেন সমগ্র বিশ্বেই স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে 'World Economic Conference'-এ চৌষট্টিটি রাষ্ট্র আলোচনা করেও এই অর্থসংকটের মীমাংসা করতে পারেনি। প্রসঙ্গত এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জার্মান, ইটালি ও জাপানে একনায়কতন্ত্রের উন্মেষ ঘটিয়ে পৃথিবীকে অপর একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে চালিত করে।

যুদ্ধ মানেই ধ্বংস-হত্যা-খাদ্যাভাব। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় বিভূতিভূষণ যখন এই উপন্যাস লিখছেন তখন খাদ্য সংকট কিছু কম ছিল না। বিভূতিভূষণের সাহিত্যসৃজনের সময়কাল ১৯২৯-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ — দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে, তাই বাংলা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রাকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে লুকিয়ে থাকা ক্ষুধার যন্ত্রণা বিভূতিভূষণ নিজ জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য প্রাচীনকাল থেকেই এই উর্বর বাংলাদেশে যতবার রাষ্ট্রীয় সংকট এসেছে ততবারই বাঙালির অন্নাভাবের সূচনা হয়েছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত অন্নহীন বাঙালির তাই কল্প-আশ্রয় হয়ে ওঠেন অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা, কিন্তু পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত, আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত উন্নত বিজ্ঞানের স্পর্শে যুক্তিবাদী বাঙালি মনন দ্বিধাহীন মধ্যযুগীয় আবেগে বলতে পারে না — 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ...'

তার চাইতে কর্মশক্তির ওপর আস্থা রাখাই শ্রেয় বলে মনে করেছিল একশ্রেণির বাঙালি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আংশিক হলেও বাণিজ্যের জগতে পদার্পণ করেছে আম-বাঙালি, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বদেশিয়ানা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) প্রতিষ্ঠা করলেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' আচার্যের স্নেহধন্য বিভূতিভূষণ বহু রচনায় শিক্ষিত বাঙালির কর্মবিমুখতার নিন্দা করেছেন, হয়তো আচার্য রচিত *অন্নসমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও প্রতিকার* গ্রন্থটি বিভূতিভূষণকে ভাবিত করে থাকবে। অন্নসমস্যা বাঙালি গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আক্ষরিক অর্থে অনুভব করেছিলেন। তাই হয়তো অসহায় বিত্তহীন হাজারি ঠাকুরকে তিনি দাঁড় করিয়ে দেন ব্যাবসাবিমুখ, আত্মসর্বস্ব অথচ অন্নহীন ক্ষুধার্ত চাকরিলোভী বাঙালি বাবুদের বিরুদ্ধে। হাজারি ঠাকুর যে পদ্ধতিতে ব্যবসায় নামে তাও

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক আধুনিক প্রথা সমবায় পদ্ধতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে আবার পাকা ব্যাবসাদারের মতো হ্যান্ডনোট লিখে ও সুদ দেবার বন্দোবস্তও সে করে। পুঁজিবাদীদের হাতে একচেটিয়া ব্যাবসার বিকল্প সমবায় পদ্ধতি এহেন তাত্ত্বিক দৃষ্টি নিয়ে হয়তো লেখক উপন্যাসের অবতারণা করেননি। কিন্তু, বাস্তব সমস্যাই তাকে বাস্তব সমাধানের পথ দেখিয়েছে। উপন্যাস রচনার চৌষট্টি বছর বাদে ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়।

উপন্যাসটি আরও ব্যতিক্রমী একারণে শুধু নয় যে এই স্বল্প চরিত্র সমন্বিত উপন্যাসের নায়ক নেহাতই এক গ্রাম্য প্রৌঢ়, বাংলা সাহিত্যের নায়কদের পাশে নেহাতই বেমানান, বরং বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের নায়কদের মধ্যেও হাজারি ঠাকুর অনন্য। লেখক তাকে অকৃপণভাবে জিতিয়ে দিয়েছেন। *পথের পাঁচালী-অপরাজিত*-র অপু স্বপ্নদর্শী, কিন্তু সে যেন স্বপ্নপূরণের নায়ক নয়, তার বিশ্বদর্শনের বর্ণনা লেখক দেননি, অথচ তাকে সহ্য করতে হয়েছিল প্রিয়জনের বিচ্ছেদ, অন্নহীনতার জ্বালা। *আরণ্যক*-এ সত্যচরণের প্রিয় অরণ্যভূমি ধ্বংস হয়েছে তার নিজের হাতে, *অনুবর্তন*-এর মাস্টারমশাইরা হারিয়ে গিয়েছে তাদের প্রিয় স্কুল থেকে, *বিপিনের সংসার*-এর বিপিন শুধু স্থান থেকে স্থানান্তরে যায় তার প্রকৃত আশ্রয় জোটে না ... বিভূতিভূষণের সব নায়ক চরিত্রই এই না পাওয়ার বেদনা বহন করেছে — একা হাজারি ঠাকুর ব্যতিক্রম। হতে পারে হাজারি ঠাকুরের চাওয়া নেহাতই জাগতিক, সেখানে সূক্ষ্মতা নেই, তাই হয়তো বিভূতিভূষণের এই উপন্যাসে প্রকৃতির রূপরসের অনবদ্য বর্ণনা অনুপস্থিত, তবুও, যে সময়ে বাজার ক্রমশ হয়ে পড়বে জুয়াচুরি, অসততা স্বার্থলোভী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র — সেই সময়ে হাজারি তার সারল্য, মানবিকতা, মমতা, দীনতা ও সর্বোপরি সততা নিয়ে জিতে যায়। জিতে যায় তার স্বপ্ন। আরও আশ্চর্য — বিভূতিভূষণের উপন্যাস-গল্পের কোনো মায়েরাই তৃপ্তি ভরে সন্তানকে খাওয়াতে পারে না, অপরিসীম দারিদ্র্য তাদের বাধা দেয়। সর্বজয়া সারাজীবন স্বপ্নই দেখে গেল সচ্ছল সংসারের, অনঙ্গ বউ নিজেকে বঞ্চিত রেখে ক্ষুধার্ত অতিথির সামনে ধরে দেয় সামান্য ভাত-তেঁতুল ... খেতে দিতে না পারার যন্ত্রণা নিয়ে বহু চরিত্র বিভূতিভূষণের লেখার ভিড় করে এসেছে — কিন্তু, একা হাজারি ঠাকুর পেরেছে। সকলকে দু-বেলা পেট ভরে খেতে দিয়ে, নিজের সন্তানকে ইচ্ছামতো সুপাত্রে দান করে, এমনকী এককালের অন্যায়কারী মনিব বেচু চক্রবর্তী ও পদ্ম ঝি-কে আশ্রয় দিয়ে শতাব্দীর সেই ক্রান্তিকালে অন্নহীন বিপন্ন বাঙালির রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে যে, সে কোনো অন্নদাত্রী দেবীমূর্তি নয় — আধময়লা ধুতি পরিহিত, গামছা-কাঁধে অখ্যাত গঞ্জ নিবাসী এক রাঁধুনী বামুন! হাজারি ঠাকুর!

না, বাংলাদেশে কোনো '২২০বি/বেকার স্ট্রিট' (?) নেই, নেই কোনো উপন্যাসের বাস্তবায়ন — পাঠক যেখানে কল্পচরিত্রের রক্তমাংসের অস্তিত্ব খুঁজতে যায়, ভারতবর্ষেই কি আছে? কিন্তু, এখনও আধা-মফস্সল রানাঘাট জংশন স্টেশনের কাছে ছোটো ছোটো ইটের তৈরি দোতলা একটা বাড়ি আছে। জানা না থাকলে রাস্তার দোকানের পাশ দিয়ে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়িটা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা খোলা ছাদ, একপাশে টবে তুলসী-দোপাটির গাছ, সামনে একটা বড়ো ঘর, দরজাটা নেহাত গৃহস্থ বাড়ির মতোই, ঢুকলে একটা ছোটো কাউন্টার,

পেছনে একটা একোরিয়াম — আর কোনো সাজসজ্জা নেই। ভেতরে আটটা টেবিল, একটা টানা জানলার পাশে, পুরোনো দিনের বড়ো জানলা, সেখানে বসলে ব্যস্ত ছোট্ট স্টেশনে ট্রেনের যাওয়া-আসা চোখে পড়ে। রোজই ভিড় — বিশেষত বর্ষাকালে সর্ষে-ইলিশ আর শীতকালে পাঁঠার মাংসের জন্য লাইন পড়ে যায় মূলত বাজারে লোকজনের। কিছুদিন আগেও শীতকালে ফুলকপি-বাদাম-কিশমিশ দিয়ে দেবভোগ্য সিঙাড়া বানানো হত — এখন কারিগরের অভাবে বন্ধ, জানালার পাশের টেবিলে বসে অতি সুস্বাদু মুগের ডাল-চচ্চড়ি মাংসের কালিয়া খেতে খেতে মনে হবে এসব রান্নার আন্তর্জাতিকীকরণ কেন যে হয় না। চৌষট্টি বছরে বড়ো বেশি বদলে গেছে সময়, তথ্যপ্রযুক্তির জালে ঘেরা, শপিং মলের আওতায় থাকা, বিজ্ঞাপনের ইশারায় চলাফেরা করা বাঙালি এখন কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাগরিক রেস্তোরাঁয় নিম্নবিত্তের কল্পনার বাইরে অস্বাভাবিক দাম দিয়ে দেশ-বিদেশের খাবারের স্বাদ নেয় ...

তবুও এখনও, হোটেলের জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে, চূর্ণী নদীতে দু-চারটে খেয়া নৌকা এখনও চলে, রাধাবল্লভ তলার সন্ধ্যারতির আওয়াজ হয়, পালচৌধুরীদের জমিদারবাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে — ট্রেন চলে যায় হুইসিল বাজিয়ে, না, এখন আর স্টেশন থেকে যাত্রী ধরে আনতে হয় না, হয়তো হাজারি ঠাকুরের রান্নার সুখ্যাতি ছোট্ট হোটেলটাকেও আজও টিকিয়ে রেখেছে — হোটেলের নাম যে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'।